কা য় রো ট্রি ল জি

সুগার স্ট্রিট

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

আরবি সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী মিশরের কথাসাহিত্যিক নাগিব মাহফুজের প্রধান সাহিত্যকর্ম 'কায়রো ট্রিলজি' বাংলায় অনুবাদ করার চিন্তা মাথায় আসে ২০১৪ সালে। এত বড় একটি কাজ শেষ করতে পারব কি না তা নিয়ে আমার নিজেরই সংশয় ছিল। অনুবাদে হাত দিলেই আমার মাঝে মৃত্যুচিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে, মৃত্যুভীতি নয়। কারণ অনুবাদের শেষ পর্যায়ে গিয়ে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে কেউ আর অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করবেন না। সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়, তিনি আমাকে 'কায়রো ট্রিলজি'র অনুবাদ শেষ করার সুযোগ দিয়েছেন। এর আগে তাঁর দুটি ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'থেবস অ্যাট ওয়ার,' এবং 'উইজডম অফ খুফু' অনুবাদ করার সময় তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষার সাবলীলতা আমাকে এতটাই আকৃষ্ট করে যে, কায়রোর একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস 'কায়রো ট্রিলজি' বাংলাভাষী পাঠকদের এবং যারা সাহিত্যকর্মের সাথে যুক্ত তাদের হাতে তুলে দিতে উদ্বুদ্ধ হই। ২০১৫ সালে 'কায়রো ট্রিলজি' অনুবাদ শুরু করি। সে বছরের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক বইমেলায় গিয়ে দেখা হয় 'নালন্দা' প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল এর সাথে। তাঁর সাথে আমার পূর্বপরিচয় ছিল না। তিনিই আমাকে শনাক্ত করেন এবং ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আমার বইগুলো পুনর্মুদ্রণ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও মেলা শেষে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণ এবং 'কায়রো ট্রিলজি' প্রকাশ করবেন, এমন সিদ্ধান্ত হয়। ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় 'কায়রো ট্রিলজি'র প্রথম খণ্ড 'প্যালেস ওয়াক' প্রকাশিত হয়। ২০১৭ সালের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড 'প্যালেস অফ ডিজায়ার'। ২০১৮ সালের একুশের বইমেলায় 'কায়রো ট্রিলজি'র তৃতীয় খণ্ড 'সুগার স্ট্রিট' প্রকাশিত হচ্ছে।

'কায়রো ট্রিলজি'তে কায়রোর একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যবিত্ত নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি মিশরীয় পরিবারকে উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে পরিবারটির তিন প্রজন্মের উত্থান-পতনের খুঁটিনাটি বিবরণ আধুনিক আরবি সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। পরিবারে পিতার অনমনীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও নাগিব মাহফুজ মায়ের ভূমিকাকেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেদেখিয়েছেন,

যদিও মায়ের অবদানের কোনো স্বীকৃতি নেই। মা শুধু পরিবারের জীবনের একমাত্র কেন্দ্র নন, তার সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর ভেতরেই, কাহিনির বর্ণনামূলক স্তরের নিচেই পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। মিশরের আধুনিক পথপরিক্রমায় এই সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটিও উপন্যাসে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে কায়রো ট্রিলজিতে পারিবারিক কাহিনির পাশাপাশি জাতীয় সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। ইউরোপের বাস্তবধর্মী উপন্যাস পাঠ করে মাহফুজ সেসবের কাঠামো ও আঙ্গিক অনুসরণ করে মিশরীয় পরিবারের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়ন 'কায়রো ট্রিলজি'। ট্রিলজি'র কাহিনিকাল দীর্ঘ, মিশরের আধুনিক ইতিহাসের চূড়ান্ত গতি নির্ণয়ের যুগকে ধারণ করেছে— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অটোমান শাসনের অবসানের লক্ষ্যে বোমাবর্ষণ এবং ১৯১৯ সালে সূচিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত একটি পর্যায় 'প্যালেস ওয়াক' এর উপজীব্য। 'প্যালেস অফ ডিজায়ার' এর কাহিনি শুরু হয়েছে পাঁচ বছর পর ১৯২৪ সালে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ পার্টির নেতা সা'দ জগলুল পাশার সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১৯২৭ সালে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। 'সুগার স্ট্রিট' এর কাহিনির সূত্রপাত ১৯৩৫ সালে ওয়াফদ পার্টির সম্মেলনে সা'দ জগলুল পাশার উত্তরাধিকারী মোস্তফা আল-নাহাসের বক্তৃতা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১৯৪৪ সালে রাজনৈতিক কর্মীদের গণগ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু উপন্যাসে এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সাময়িক প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে মূল বিবরণের অন্তর্নিহিত স্মৃতি হিসেবে, যা উপস্থাপনার সাথে অবিচ্ছেদ্য।

আমরা দেখতে পাই যে, সময় ও দেশের রাজনীতির সাথে একটি পরিবারের জীবন কীভাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায় এবং পরিস্থিতির সাথে বিভিন্ন সময়ে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। কাহিনির বিভিন্ন পর্যায় পাঠকের মনোযোগ এড়ানোর মতো নয়। কামাল যখন আয়িদার প্রেমে পড়ে, তখন আয়িদার সামাজিক শ্রেণি তার কাছে মুখ্য ছিল না; বরং তার সংস্কৃতি, ইউরোপীয় বোধ ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাই প্রধান আকর্ষণ ছিল। প্রচলিত ঐতিহ্যের বাইরে থেকে আয়িদা নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করার ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন আর কামালের মধ্যে ছিল মিশরের সার্বিক বিকাশের স্বপ্ন। মিশর নিয়ে কথা বললেই তার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয় আয়িদা। কিন্তু কামালের সাথে আয়িদার প্রেম ব্যর্থ হয়, যাকে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খুঁটিনাটি উঠে এসেছে উপন্যাসে। 'কায়রো ট্রিলজি'র সুদূরপ্রসারী রূপকল্পও ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা ছিল। উপন্যাসটির প্রতিটি খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে একটি মৃত্যু ও একটি জন্ম দিয়ে এবং শেষ খণ্ড 'সুগার স্ট্রিটে'ও মৃত্যু ও জন্ম ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমিনার মৃত্যু এবং তার দুই

নাতি আহমদ ও আবদ আল-মু'নিমের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। একজন কমিউনিস্ট, অপরজন মুসলিম ব্রাদার। দুজন সুগার স্ট্রিটের একই বাড়ি থেকে দুই বিপরীতমুখী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের ধারকের উদ্ভব এবং শেষ পর্যন্ত তারা উভয়ে কারাগারে একই প্রকোষ্ঠে বন্দি। কিন্তু ট্রিলজির শেষ খণ্ডে জন্ম বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নবজাত একজন ইসলামপন্থির পুত্র, যা আরব জগতের বর্তমান বাস্তবতার সাথে এখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'কায়রো ট্রিলজি' তিনটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত হলেও নাগিব মাহফুজের উদ্দেশ্য ছিল একটি গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা। এটির রচনা শেষ হলে তিনি ফুলস্কেপ কাগজে একহাজার পৃষ্ঠার অধিক আকৃতির পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে তার প্রকাশক সাঈদ আল-শাহারের কাছে যান। তিনি পাণ্ডুলিপি না পড়েই শুধু এর আকৃতি দেখে মন্তব্য করেন, "এটি কোন ধরনের দুর্যোগ?" বিশাল উপন্যাস প্রকাশের বিপুল ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে তিনি মাহফুজকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেন, যদিও আরবি সাহিত্যের দিকপাল তাহা হোসেন উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। প্রকাশকের আচরণে নাগিব মাহফুজ মনঃক্ষুণ্ন হন এবং ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয় তাঁর। এ অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন নতুন সরকারের সাহিত্যবিষয়ক অধিকর্তা ইউসুফ আল-সিবাই। তিনি 'আল রিসালাহ আল-জাদিদাহ' নামে একটি মাসিক সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য একটি ভালো উপন্যাস খুঁজছিলেন। তিনি নাগিব মাহফুজের কাছে জানতে চান যে, তাঁর নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি আছে কি না। মাহফুজ তাঁকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানানো উপন্যাসটি সম্পর্কে জানালে আল-সিবাই গ্রন্থের দৈর্ঘ্যের কারণে হতাশ না হয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখান। এভাবে 'আল-রিসালাহ আল জাদিদাহ' সাময়িকীতে 'বায়ান আল কাসরায়েন' বা 'প্যালেস ওয়াক' প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে পুরো উপন্যাসের এই নামই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটির প্রকাশ শেষ হওয়ার আগেই সাময়িকীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সাময়িকীতে যে অংশগুলো প্রকাশিত হয়েছিল তা পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, মাহফুজ এক মহান সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকাশক সাঈদ আল-শাহার তখনো সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যদিও তিনি ১৯৫৬ সালে উপন্যাসের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অংশটুকু প্রকাশ করতে সম্মত হন, যেটি 'প্যালেস ওয়াক' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ব্যবসা-সফল হওয়ার পর প্রকাশক মাহফুজকে উপন্যাসের আরেকটি অংশ দিতে বলেন, যার প্রকাশনা ব্যয় তাঁর সাধ্যের মধ্যে থাকবে। মাহফুজ তাঁকে উপন্যাসের অবশিষ্ট দুটি খণ্ড প্রদান করেন, যা 'কসর আল-শউক' ও 'আল-সুক্কারিয়া' নামে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই তিনটি নামই কায়রোর গামালিয়া এলাকার তিনটি রাস্তার নাম।

'কায়রো ট্রিলজি'তে আবদ আল-জাওয়াদ পরিবারের বাড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। নাগিব মাহফুজ সেই বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ এবং ছাদসহ গোপন জায়গার কথা উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, যে জায়গাগুলো পরিবারের সদস্যদের এবং

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলিত হওয়ার দৃশ্যপট ছিল। ১৯১৯ সালের বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাব ছিল তাঁর ওপর, যখন তাঁর মধ্যে প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার প্রভাব দেখা যায় তাঁর রচনায়। ১৯৫২ সালের বিপ্লব তাঁর মাঝে সম্ভবত কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর অনেক রচনায় তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অনেক বুদ্ধিজীবীকে নাসের ভিন্নমত প্রকাশের অভিযোগে গ্রেফতার করলেও মাহফুজ গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের দিকে তাঁর পরিবার গামালিয়া থেকে নতুন শহরতলি আব্বাসিয়ায় চলে যায়। মাহফুজের বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস 'কায়রো ট্রিলজি', তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয় এবং তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেন। বিশাল এ উপন্যাসটির একই কাহিনিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 'বায়ান আল-কাসরায়েন' (প্যালেস ওয়াক-১৯৫৬), 'কসর আল শউক' (প্যালেস অফ ডিজায়ার-১৯৫৭) ও 'আল-সুক্কারিয়া' (সুগার স্ট্রিট-১৯৫৭)। তাঁর আরেকটি উপন্যাস 'আওলাদ হারাতিনা' যার ইংরেজি অনুবাদ 'চিলড্রেন অফ গ্যাবেলাউয়ি' নামে প্রকাশিত হয় এবং নাগিব মাহফুজের জীবনের গতি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয় তাঁর এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। ধনবান ও ক্ষমতাধর গ্যাবেলাউয়ি যখন তাঁর সন্তানদের বাড়ি থেকে বের করে দেন, যেন তাদেরকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হলো। গ্রন্থটির জটিল বর্ণনারীতিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা সন্তানদের ভাগ্য নির্ধারণ করে, যেখানে ব্যাখ্যাতীত মূল চরিত্র দৃশ্যপটের বাইরে এবং নিজেকে যে বাড়িতে গুটিয়ে নিয়েছেন তা শুধু দূর থেকে দেখা যায়। নাগিব মাহফুজ তাঁর উপন্যাসে এক অর্থে সৃষ্টির সূচনা থেকে ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একই সাথে এটি কায়রোর শহরতলির শিশুরা যে কী যাতনার মধ্যে কাল কাটায় তাও উঠে এসেছে। তাঁর বিবরণে কুরআনের বাণী, রাসুলের হাদিসের উদ্ধৃতি আছে। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্যাবেলাউয়ি স্বয়ং আল্লাহর প্রতিভূ, সর্বশক্তিমান। অনুরূপ অন্যান্য মূল চরিত্রগুলো, যেমন: ইদ্রিস, আদহাম, জাবাল, রিফাআ, কাসিম ও আরাফা প্রতিনিধিত্ব করেছে শয়তান, মুসা, যিশু ও মুহাম্মদ (সা.) এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে। কিন্তু কাহিনির কাঠামো ও পরিবেশ কায়রোর উপকণ্ঠে মুকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে ছোট্ট শহরের ততোধিক ছোট মহল্লার পারিবারিক কলহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সেবাযত্নকেন্দ্রিক। পরিবারের কিছু সদস্য স্থানীয় প্রধানকে ভয় পায় অথবা অনুসরণ করে। অন্যদিকে অনেকে উন্নত আদর্শ আঁকড়ে থাকে। 'আওলাদ হারাতিনা' যখন ১৯৫৯ সালে কায়রোর বিখ্যাত দৈনিক 'আল-আহরামে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিদ ও ইসলামি নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং উপন্যাসটিকে ধর্মবিদ্বেষী বর্ণনা করে এটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। জনগণও বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু সরকার উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করেনি এবং আল-আহরামেরও ধারাবাহিক প্রকাশনা বন্ধ হয়নি। কিন্তু গ্রন্থাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিদেশে। পরবর্তীতে মিশর থেকেও এটি প্রকাশিত হয়।

এ উপন্যাসে কায়রোর শহুরে জীবনের বিবরণ সবিস্তারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করতে ছয় বছরের অধিক সময় লেগেছে— ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। মিশরের পুরনো শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত পতন এবং গ্রন্থটির রচনার পরিসমাপ্তির একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি রচনা করতে তিনি জন গালসওয়ার্দির 'দি ফার্সাইট সাগা' ও টমাস মানের 'বাডেনব্রুকস' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক আরবি সাহিত্যে 'দি কায়রো ট্রিলজি' প্রথম পারিবারিক কাহিনি। অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেও এটির ব্যাপকতা ছাড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। মাহফুজ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ছিলেন, কারণ ১৯৪২ সালে তাঁর পছন্দের রাজনৈতিক দল ওয়াফদ পার্টি ব্রিটিশের অনুরোধে সরকার গঠন করতে সম্মত হওয়ায় তিনি পুরনো ওয়াফদ পার্টির আদর্শের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিলেন। অতএব, ট্রিলজি তাঁর নিজস্ব দিক-নির্দেশনার অনুসন্ধান এবং ব্যক্তিগত চেতনা ও ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। এটি আধুনিক মিশরের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের বর্ণনামূলক রেকর্ড, যেখানে জাতীয় পরিচিতি এবং আধুনিক বিশ্বে মিশরের অবস্থান খোঁজা হয়েছে। এছাড়া এতে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃশ্য সুনিপুণভাবে অঙ্কন করার পাশাপাশি মানুষের সম্পর্কের সকল দিক উঠিয়ে আনার চেষ্টাও লক্ষণীয়। সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মূল্যবান দলিল ছাড়াও 'দ্য কায়রো ট্রিলজি'র সাহিত্যমান অনন্যসাধারণ।

'কায়রো ট্রিলজি' প্রধানত পরিবারকেন্দ্রিক এবং উপন্যাসে বিধৃত রাজনৈতিক ঘটনাগুলো পরিবারের সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট বা তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু মাত্র। জাওয়াদ পরিবারের গৃহস্থালি ও সামাজিক বিষয়গুলো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হয়। দিনের সূচনা হয় ভোরে নিচতলায় আটা গোলার মধ্য দিয়ে মায়ের ফজরের নামাজ শেষে। বাড়িতে প্রত্যেকের অবস্থান তার মর্যাদার ভিত্তিতে নির্ধারিত। বাড়ির প্রধান ব্যক্তি আল-সাইয়িদ আহমদ আবদ আল-জাওয়াদ থাকেন সর্বোচ্চ তলায়। মা ও ছেলেরা দ্বিতীয় তলায় এবং মেয়েরা নিচতলায়। রান্নাঘর বাড়ির আঙিনার একপ্রান্তে, কিন্তু সেখানে মায়ের কর্তৃত্ব একচেটিয়া। এর ফলে পুরুষের ওপর মায়ের সামাজিক মর্যাদার দিক এবং পারিবারিক গৃহস্থালির সকল বিষয়ে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকালের নাশতা তৈরির পর মা খাবার সাজিয়ে আনেন ট্রেতে এবং সকলের নাশতা পরিবেশন ও তত্ত্বাবধান করেন। পরিবারের সকলে এ সময়ে একত্রে মিলিত হয়। পরিবেশিত খাবারের মধ্য দিয়ে পরিবারের পটভূমি এবং জাতীয় পরিচিতিও ফুটে ওঠে। নাশতায় ডিম, পনির, বিন, লেবুর আচার, গোলমরিচের গুঁড়া, গোলাকৃতির সদ্য বানানো রুটি পরিবেশনে পরিবারটির মিশরীয় মানে উচ্চ মধ্যবিত্ত অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। নাশতার সময় বসার ব্যবস্থা থেকেও আঁচ করা যায় যে, জাওয়াদ পরিবার ক্রমশ উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায়

উন্নীত হচ্ছে। পরিবারপ্রধানের সঙ্গে শুধু তাঁর তিন পুত্রসন্তানই খেতে বসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। মা তাদের সাথে খাওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত না হলেও যেকোনো প্রয়োজনে সাড়া দিতে রুমেই অবস্থান করেন। নিচতলায় যিনি কর্তৃত্বের জন্য সর্বেসর্বা, ওপরতলায় তাঁর অবস্থান বাক্‌হীন প্রান্তিক ব্যক্তির মতো। তিন ছেলে খাবার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করে কখন তাদের পিতা খেতে শুরু করবেন। তাঁকে একে একে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী অনুসরণ করে ইয়াসিন, ফাহমি ও সবশেষে কামাল। এর মধ্য দিয়ে পৈতৃক কর্তৃত্বের প্রতি উচ্চতর আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন ফুটে ওঠে। নাশতার টেবিলে পিতার কর্তৃত্ব একক ও প্রশ্নাতীত। কিন্তু বিকালে কফির আসরে মায়ের প্রভাব অপরিসীম। তখন নিপীড়নতুল্য পিতৃতান্ত্রিক রীতির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক আবহ ফিরে আসে এবং অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে তাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে। নাশতার স্থান ওপরতলা, যেখানে শুধু পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অংশ নেয়, কিন্তু কফির আসরের স্থান দোতলায়, যেখানে পিতা ছাড়া অন্য সকল সদস্য অংশ নেয়। যদিও সবাই কফি পানের সুযোগ পায় না, কিন্তু প্রত্যেকে সামাজিক রীতিতে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। এখানে তারা একত্রিত হয় এবং যার যার প্রয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করে ও তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নাশতা সেরে পিতা চলে যান তাঁর রুমে। মা তাঁকে অনুসরণ করেন একটি কাপে দুধ ও মধু মিশ্রিত তিনটি কাঁচা ডিম নিয়ে। এই স্থানের বর্ণনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন দাওয়াই এর কথা, যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর, পিতার ক্ষুধাবর্ধক অথবা এসব যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন। ওষুধমিশ্রিত কিছু খাবার তৈরি করা হয় মেয়েদেরকে মোটা ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। প্রতিদিনের খাবার বা কফি পানের সময়ে পরিবারের রাজনীতি মূর্ত হয়ে ওঠে। 'প্যালেস অফ ডিজায়ারে' দেখা যায় ফাহমির মৃত্যু ও দুই কন্যার বিয়ের পর কফির আসর দোতলা থেকে নিচতলায় বসছে। দুটি ঘটনাই মায়ের হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত ছিল, কারণ এর ফলে তাঁর সামাজিক আনন্দের উৎস নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পরিবারটির ওপর আরেকটি আঘাত আসে শাদ্দাদের বাড়ির দিক থেকে। আয়িদার বাড়ির আধুনিকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায় তিনি পিরামিডের পিকনিকে যে বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে আসেন তার মধ্য দিয়ে। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ফারাওবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। খাবারের আয়োজনে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় মানুষের সামাজিক শ্রেণি, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ক্ষণে ক্ষণে আচরণের পার্থক্য ও রুচি, কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে কামালের জীবনেও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।

'সুগার স্ট্রিট' এ কফির আসর আবার দোতলায় উঠে আসে এবং এর মধ্য দিয়ে সম্পর্কগত পরিবর্তনের বিরাট একটি দিক সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সুন্দরী ছোট মেয়ে আয়িশার জীবনে একটির পর একটি অঘটন ঘটতে থাকে এবং দুর্ভোগ সহ্য করার মধ্য দিয়ে সে প্রকাশ্যে ধূমপান ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে কফির আসরে অংশ নেওয়াসহ বেশ কিছু বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায়। কফি

পানের আসর মেয়েদেরকে নিচতলা থেকে ওপরের তলায় তুলে আনে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আধা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারপ্রধানের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতিতে এটি সম্ভব হয়ে ওঠে, যখন তিনি বাড়ির সর্বোচ্চ তলা থেকে দোতলায় নেমে আসতে বাধ্য হন। এখন তিনি সামান্য খাবার গ্রহণ করেন, নৈশ অভিসারে গিয়ে খাদ্য ও মদ্য গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হলে তাঁকে নিচতলায় আনা হয় এবং শয্যাশায়ী হয়ে পুরোপুরি স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমিনা শেষ পর্যন্ত তাঁর দোতলার রুমেই অবস্থান করেন। পরিবারের প্রধান পুরুষের কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে মায়ের ক্ষমতার উত্থান অনিবার্য হলেও আমিনা আরো সহনশীল আচরণের হয়ে ওঠেন। তিনি বাস্তব কথা বলেন, জোরের সাথে কথা বলেন।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউ ইয়র্ক

১

কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালানো পাত্রটি ঘিরে রেখেছে তাদের মাথা, আগুনের ওপর প্রসারিত তাদের হাত: আমিনার শীর্ণ ও অস্থিসর্বস্ব, আয়িশার দৃঢ় ও কঠিন এবং উম্মে হানাফির কচ্ছপের খোলসের মতো। সবচেয়ে সুন্দর শ্বেতশুভ্র হাত নাঈমার। জানুয়ারি মাসের ঠান্ডা এত প্রচণ্ড যে, ড্রয়িং রুমের প্রান্তে রাখা পানির কাছেও ভীতিকর, রঙিন মাদুর এবং সোফার মতো সেই পানির পাত্র সেখানে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। তেলের প্রদীপসহ পুরনো লণ্ঠন উধাও হয়ে গেছে এবং সেটির স্থানে ঝুলছে একটি বৈদ্যুতিক বাতি। পরিবর্তন হয়েছে স্থানেরও। কফি পান করার জায়গাটি ফিরে এসেছে বাড়ির দোতলায়। পিতার জীবন সহজ করতে ওপরের পুরো তলা নেমে গেছে নিচতলায়, যার হৃৎপিণ্ডে এখন আর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার মতো দৃঢ়তা নেই।

পরিবারের সদস্যদের মাঝেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমিনার শরীর ভেঙে গেছে, মাথার চুল সাদায় রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও তাঁর বয়স এখন ষাট বছর, কিন্তু তাঁকে আরো দশ বছরের বেশি বয়সের মনে হয়। তবুও তাঁর দৈহিক পরিবর্তন আয়িশার ক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্যের তুলনায় তেমন কিছু নয়। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, মেয়ের চুল সোনালি এবং চোখ নীল, কিন্তু তার দৃষ্টিতে যেন জীবন নেই এবং তার ফ্যাকাশে রং কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আভাস বলে মনে হয়। শরীরের দৃশ্যমান অস্থি, বসে যাওয়া চোখ ও গাল দেখে তাকে ত্রিশ বছরের কোনো মহিলা মনে হয় না। বয়স যদিও উম্মে হানাফির ওপর ভালোভাবে ভর করেছে, কিন্তু আবশ্যকীয় কোনোকিছুতে তা ধরা পড়ে না, শরীরে মাংস ও চর্বি জমে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি লক্ষণীয় নয়। তার ত্বক, গলা ও মুখে যেন মাটির পৃথক আস্তরণ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের নীরব বিষাদের মাঝে তার গভীর দৃষ্টি সবসময় অংশগ্রহণ করছে।

কোনো কবরস্থানে ফুটে ওঠা একটি গোলাপের মতো দলটি থেকে উঠে দাঁড়াল ষোলো বছরের সুন্দরী তরুণী নাঈমা। তার মাথা জুড়ে সোনালি চুলের

খোঁপা এবং মুখমণ্ডলে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো তার আকর্ষণীয় নীল চোখ। মায়ের মতোই সুন্দর তার মুখশ্রী। আয়িশা বেশ সুন্দরী ছিল এবং এখনো অনেক আকর্ষণীয়, কিন্তু ছায়ার মতো অনুল্লেখ্য। তার চোখ ছিল পরিশীলিত, স্বপ্নাতুর, পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি, নিষ্পাপ ও ভিন্ন এক পৃথিবীর স্পর্শ তার মাঝে। মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল নাঈমা, যেন একমুহূর্তের জন্যও একা থাকতে অনিচ্ছুক। আগুনের ওপর প্রসারিত দুই হাত ঘষে উম্মে হানাফি বললেন, "মিস্ত্রিরা দেড় বছর ধরে কাজ করার পর এ সপ্তাহে নির্মাণ কাজ শেষ করবে...।"

নাঈমা বিদ্রুপ করে বলল, "শরবত বিক্রেতা বায়ূমি চাচার বাড়ি...।"

আয়িশা আগুনের ওপর থেকে উম্মে হানাফির দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালেও কোনো মন্তব্য করল না। তারা আগে থেকেই জানে যে, এক সময় যে বাড়িটির মালিকানা মোহাম্মদ রিদওয়ানের সেই বাড়িটি ভেঙে সেখানে শরবত বিক্রেতা বায়ূমি চাচার জন্য চার তলাবিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। নতুনভাবে নির্মীয়মাণ বাড়িকে কেন্দ্র করে মরিয়ম ও ইয়াসিনের মধ্যে তালাকের ঘটনাসহ অনেক স্মৃতি জেগে উঠেছে। মরিয়মের কী হয়েছে? এবং তার মা ও শরবত বিক্রেতা বায়ূমির সাথে তার বিয়ের ঘটনা, যিনি উত্তরাধিকার হিসেবে বাড়িটির অর্ধেক পেয়েছেন এবং বাকি অর্ধেক কিনে নিয়েছেন। তখন জীবন ছিল উপভোগ্য এবং হৃদয় ছিল উদ্দাম, উন্মুক্ত।

উম্মে হানাফি তার কথা অব্যাহত রেখেছেন: "মালকিন, এখন এটির সবচেয়ে সুন্দর দিক হবে বায়ূমি চাচার নতুন জায়গাটিতে থাকবে কোমল পানীয়, আইসক্রিম ও মিষ্টি। এতে অনেক আয়না ও বৈদ্যুতিক বাতি এবং দিনরাত সেখানে বাজবে একটি রেডিও। আমার দুঃখ লাগছে নাপিত হাসনাইন, সিমের বীজ বিক্রেতা দারবিশের জন্য, দুধ বিক্রেতা আল-ফুলি এবং মিষ্টি বিক্রেতা আবু সারির জন্য। তাদের সাবেক সঙ্গীর দোকানের তুলনায় তারা নিজেদের ভাঙাচোরা দোকান নিয়ে মনস্তাপের মধ্যে কাটাবে।"

আমিনা তাঁর শাল কাঁধের ওপর ভালোভাবে জড়িয়ে বললেন, "সবই আল্লাহর মহিমা, যিনি অনুগ্রহ বর্ষণের মালিক...।"

নাঈমা দুহাতে মায়ের গলা জড়িয়ে বলল, "ভবনটি আমাদের ছাদের খোলা দিকটিকে বন্ধ করে ফেলবে। ওখানে যখন লোকজন বসবাস করতে শুরু করবে, তখন আমরা ছাদে সময় কাটাব কীভাবে?"

আমিনা তাঁর সুন্দরী নাতনির উঠানো প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, বিশেষ করে আয়িশার জন্য তাঁর উদ্বেগের কারণে। তিনি বললেন, "ভাড়াটের দিকে কোনো মনোযোগ দিও না। তোমার যা খুশি তুমি তা করবে।"

তিনি আয়িশার দিকে তাকালেন তাঁর উত্তরে মেয়ের ওপর কী প্রভাব পড়ল তা আঁচ করতে। মেয়ের বিষয়গুলো নিয়ে তিনি এত শঙ্কিত যে, তাঁর মনে হলো আয়িশা তাঁর কথায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আয়িশা তার রুম ও তার বাবার রুমের মাঝখানে টানানো আয়নায় নিজেকে দেখতে ব্যস্ত ছিল। যদিও তার কাছে এখন অর্থহীন মনে হয়, তবুও সে নিজের প্রতিফলন দেখার রীতি পরিত্যাগ করতে পারেনি। অতিক্রান্ত দিনগুলোতে তার চেহারার মালিন্যেও যে ছায়া পড়েছে তাতে সে আর উদ্বিগ্ন অনুভব করে না।

যখনই তার ভেতরে একটি কণ্ঠ জানতে চায়, "সেই আগের আয়িশা কোথায়?" সে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দেয়, "আর কোথায় তার ছেলেরা, মোহাম্মদ ও ওসমান এবং তার স্বামী খলিল?"

এ দৃশ্য আমিনাকে বিষণ্ন করে তোলে এবং তাঁর বিষাদ উম্মে হানাফির ওপর দ্রুত প্রভাব ফেলে, যিনি এ পরিবারের এমন একটি অংশ যে পরিবারের যেকোনো উদ্বেগ তাঁর নিজের দুশ্চিন্তা হয়ে ওঠে।

নাঈমা উঠে রেডিও'র কাছে গেল, যেটি ডাইনিং রুম ও আরেক রুমের মাঝখানে রাখা আছে। রেডিও খুলে সে বলল, "মা, এখন গানের রেকর্ড বাজানোর সময়।"

আয়িশা একটি সিগারেট ধরিয়ে গভীরভাবে টান দিলো। আমিনা ধোঁয়ার দিকে তাকালেন, ধোঁয়া হালকা মেঘের মতো আগুনের পাত্রের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। রেডিওতে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো, "পুরনো সুদিনের সাথিরা, কীভাবে আমি আপনাদের ফিরে আসার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছি।"

নাঈমা তার জায়গায় ফিরে আসতে আসতে তার জামা গুঁজে নিল। সে মায়ের মতোই গান পছন্দ করে। মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনছিল সে, যাতে গানটি মুখস্থ করে তার মধুর কণ্ঠে গাইতে পারে। তার পুরো আবেগময় জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখা ধর্মীয় অনুভূতিতেও এই আগ্রহ অবদমিত হয়নি। দশ বছর বয়স থেকে সে নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়ে এবং রমজান মাসে রোজা রাখে। প্রায়ই সে আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যকেন্দ্রিক স্বপ্ন দেখে এবং আল-হুসাইন মসজিদ জিয়ারতে যাওয়ার জন্য নানির আমন্ত্রণে সীমাহীন আনন্দে সাড়া দেয়। পাশাপাশি সে গানের প্রতি তার ভালোবাসাকেও কখনো ম্লান হতে দেয়নি। যখনই সে একা তার রুমে অথবা বাথরুমে থাকে তখনই মনের আনন্দে গান গায়।

আয়িশা তার বিদ্যমান একটি সন্তানের সবকিছুকে অনুমোদন করেছে। কারণ অন্য সব দিক থেকে তার অন্ধকার দিগন্তে নাঈমা একমাত্র উজ্জ্বল আশা। মেয়ের সৌন্দর্য এবং তার কণ্ঠে মুগ্ধ আয়িশা তার প্রতি মেয়ের

অতিরিক্ত সংলগ্নতাকে ভালোবেসেছে ও উৎসাহ দিয়েছে, এ ব্যাপারে কারো কোনো মন্তব্য সহ্য করেনি। আসলে কোনো ধরনের সমালোচনা তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত, তা যত তুচ্ছ বা ভালো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। বাড়িতে তার একমাত্র কাজ ছিল বসে থাকা, কফি পান এবং ধূমপান করা। তার মা যখনই তাকে ডেকে পাঠাতেন বাড়ির কাজে সহায়তা করতে, আসলে তা সহায়তার প্রয়োজনের চেয়ে আয়িশাকে তার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে হতো, কিন্তু আয়িশা বিরক্তি বোধ করে তার বিখ্যাত উক্তিটি করত, "ওহ, আমাকে একা থাকতে দিন।" সে নাঈমাকেও কাজে সাহায্য করার জন্য একটি আঙুল তুলতে দিত না। কারণ মেয়ের যেকোনো ক্ষুদ্র বিষয়েও সে ভয় করতো। নাঈমার জন্য যদি তার পক্ষে নামাজ, রোজার মতো ইবাদত করা সম্ভব হতো, তাহলে আয়িশাই নাঈমার হয়ে তা করে দিত, যাতে তাকে ইবাদতের কষ্টটুকুও করতে না হয়।

আমিনা প্রায়ই এ ব্যাপারে আয়িশাকে সতর্ক করে দিয়ে তাকে বলতেন, নাঈমা প্রায় বিয়ের বয়সে পৌঁছেছে এবং এখন তার গৃহস্থালির দায়িত্ব ও কর্তব্য শেখা উচিত। আয়িশা সবসময় রেগে সাড়া দেয়, "আপনি দেখছেন না সে কেমন ছায়ার মতো? আমার মেয়ে কোনো পরিশ্রমের কাজ সহ্য করতে পারবে না। ওকে ওর মতো থাকতে দিন। এ দুনিয়ায় সে আমার একমাত্র আশা ভরসা।"

আমিনার বুক ভেঙে যায়, তিনি এ আলোচনা পরিহার করেন। আয়িশার দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি তাঁর মেয়ের খান খান হয়ে যাওয়া একান্ত আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবেন। যখন তিনি এই অসুখী মুখের পানে তাকান, যে মুখ থেকে সকল উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেছে, তাঁর হৃদয় বিষাদে ভরে ওঠে। মেয়েকে যাতে কোনোভাবে আরো দুঃখের মাঝে ফেলতে না হয় সেজন্য তাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয় বলে তিনি আয়িশার রূঢ় ও কঠিন মন্তব্যগুলোকেও ভালোবাসার সাথে সহ্য করতে শিখেছেন।

কণ্ঠটি গেয়ে চলেছে, "পুরনো সুদিনের সাথিরা," আয়িশা ধূমপান করতে করতে শুনছিল। এক সময় সে গান গাইতে পছন্দ করত। বিষণ্নতা ও হতাশা তার গানের স্বাদকে হত্যা করেনি। সম্ভবত তা আরো বেড়েছে, যেহেতু অধিকসংখ্যক গানই সরল ও বিষণ্নতায় ভরা। কোনোকিছুই আর কখনো তার পুরনো সুদিনের সাথিদের ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অনেক সময় সে অবাক হয়ে ভাবে সেই অতীত কি বাস্তবতা অথবা স্বপ্ন ছিল, তার কল্পনার ক্ষীণ সূত্র ছিল? সেই সুখের আবাস এখন কোথায়? কোথায় সে তার স্বামীকে

খুঁজে পাবে? উসমান এবং মোহাম্মদ কোথায়? সেই অতীত থেকে কি শুধু আটটি বছর বিচ্ছিন্ন?

আমিনা এসব গান খুব একটা পছন্দ করেন না। রেডিওতে তাঁর প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে, রেডিও'র কারণে তিনি পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত এবং খবর শোনার সুযোগ পান। গানের বিষাদপূর্ণ মর্ম তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। তাঁর কন্যার ওপর গানের কথার প্রভাব ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং উম্মে হানাফির কাছে একদিন মন্তব্য করেন, "কথাগুলো কি মৃতের জন্য শোকগাথার মতো মনে হয় না?"

আয়িশা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ বন্ধ করতে পারেন না আমিনা এবং তিনি যে উচ্চ রক্তচাপের রোগী তা প্রায় ভুলেই যান। আল-হুসাইন এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মাদের মাজার ও দরগা জিয়ারত করাই তাঁর কাছে একমাত্র স্বস্তিদায়ক কাজ ছিল। আল-সাইয়িদ আহমদকে ধন্যবাদ, তিনি এখন আর মাজার জিয়ারতে আমিনাকে বাধা দেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করেন তখনই তড়িঘড়ি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। আমিনা আগে যেমন ছিলেন, এখন আর আগের সেই নারী নেই। দুঃখ এবং অসুস্থতা তাঁর মাঝে অনেক পরিবর্তন এনেছে। অতিক্রান্ত বছরগুলোতে তিনি তাঁর বিস্ময়কর কর্মচাঞ্চল্য এবং তাঁর ঘর গোছানো, পরিচ্ছন্নতা, সংসার পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়েছেন। শুধু আল-সাইয়িদ আহমদ ও কামালের প্রতি খেয়াল রাখা ছাড়া তিনি বাড়ির কাজে সামান্যই মনোযোগ দেন। এক সময় যিনি সব কাজের তদারকিতে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং রান্নাঘর ও স্টোরের দায়িত্ব পুরোপুরি অর্পণ করেছিলেন উম্মে হানাফির ওপর। তদারকিও আর ভালো লাগত না তার। উম্মে হানাফির ওপর তাঁর আস্থা সীমাহীন। কারণ উম্মে হানাফি এ বাড়ির অংশে পরিণত হয়েছিলেন। সারাজীবনের সাথি হিসেবে তিনি আমিনার সাথে সুসময় ও দুঃসময় কাটিয়েছেন এবং পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি পরিবারের সবার আনন্দ-বেদনা সম্পর্কে জানতেন।

কিছুসময়ের জন্য তারা নীরব রইলেন, যেন গান তাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে। নাঈমা বলল, "আজ আমি আমার বন্ধু সালমাকে রাস্তায় দেখলাম। আমার সাথে একই স্কুলে পড়ত। সে আগামী বছর ব্যাচেলর পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

আয়িশা বিরক্তির সাথে মন্তব্য করল, "তোমার নানা যদি শুধু তোমাকে স্কুলে থাকতে দিতেন, তাহলে তুমি ওর চেয়ে এগিয়ে থাকতে। কিন্তু তিনি তোমাকে স্কুলে যেতে দিতে অস্বীকার করেছেন।"

আয়িশার প্রতিবাদের শেষ কথা তাঁর মায়ের কান এড়ায়নি। তিনি বললেন, "ওর নানা অন্য চিন্তা করেছিলেন এবং ওই পরিকল্পনা এখনো তিনি পরিত্যাগ করেননি। পড়াশুনার জন্য যে চেষ্টা জড়িত, তা সত্ত্বেও কি তুমি ওর পড়াশুনা চালিয়ে নিতে চেয়েছিলে। সে এত কোমল একটা মেয়ে যে ক্লান্তি সহ্য করতে পারে না?"

আয়িশা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। কিন্তু নাঈমা দুঃখের সাথে বলল, "আমি যদি আসলেই আমার পড়াশুনা শেষ করতে পারতাম! আজকাল সব মেয়েই ছেলের মতো পড়াশুনা করে।"

উম্মে হানাফি ভর্ৎসনার সাথে বললেন, "তারা পড়াশুনা করে কারণ তারা কোনো বর খুঁজে পায় না। কিন্তু তোমার মতো একজন সুন্দরী মেয়ের...।"

আমিনা তার কথার সাথে একমত পোষণ করে বললেন, "ছোট্ট মেয়ে, তুমি যথেষ্ট শিক্ষিত। তুমি গ্রেড স্কুলের সার্টিফিকেট পেয়েছ। তোমার যেহেতু কোনো চাকরি করার প্রয়োজন নেই, তাহলে তোমার আর এর বেশি পড়াশুনা করার কি প্রয়োজন? আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে শক্তি দান করুন, তোমার সুস্বাস্থ্যের সাথে তোমার সৌন্দর্য অটুট থাকুক। তোমার অস্থিতে কিছু মাংস ও চর্বি যোগ হোক।"

আয়িশা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল, "আমি চাই ওর স্বাস্থ্য ভালো হোক, কিন্তু কিছুতেই মোটাসোটা নয়। মোটা হওয়া এক ধরনের ত্রুটি, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। ওর বয়সে ওর মা অনেক সুন্দরী ছিল, কিন্তু সে মোটা ছিল না।"

আমিনা হেসে কোমল কণ্ঠে বললেন, "কথাটা সত্য। নাঈমা, তোমার মা ওর সময়ে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল।"

আয়িশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আর এরপর সে তার সময়ের কাহিনির মতো নারীতে পরিণত হয়েছে।"

উম্মে হানাফি বিড়বিড় করে বললেন, "আমাদের প্রভু নাঈমার সাথে তোমার সুখী জীবন দিক।"

মেয়ের পিঠে স্নেহের সাথে হাত বুলিয়ে আমিনা বললেন, "আমিন! হে বিশ্ব প্রতিপালক।" তারা নীরবতা পালন করলেন। নতুন কণ্ঠের আরেকটি গান ভেসে আসছিল রেডিও থেকে, "আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখতে চাই।"

এরপর বাড়ির দরজা খুলল এবং বন্ধ হলো। উম্মে হানাফি বললেন, "আমার মনিব।" তিনি দ্রুত উঠে রুমের বাইরে গিয়ে সিঁড়ির বাতি জ্বালালেন।